প্রিয় শহরকে নতুন করে জানা

যুগশঙ্খ SUPPLI

কলকাতা

সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

সুপারসোনিক জেটের গতিতে এগোচ্ছে জীবন। সিভিলাইজেশনের এফেক্ট সর্বত্র। ক্যালেন্ডারের পাতা ওলটানোর সাথে সাথে অতিদ্রুত আপগ্রেডেশনের এই প্রযুক্তি নির্ভর জীবনধারাকে ক্রমশ গ্রাস করছে কর্পোরেট। ঝা–চকচকে শপিংমল থাকতে ফিতের মাপ দিয়ে জামা বানানোর রীতি এখন খানিকটা ব্যাকডেটেডই বটে, আর তা যদি হয় আবার আদ্যিকালের সেলাই মেশিনে! তবু আজও কিছু মানুষের রুজি-রুটি জোগায় এই সেলাই মেশিন। তাই রাস্তার ধারে ছোট্ট কুটুরি, থুড়ি দোকানে ঠায় বসে থেকে খদ্দেরের অপেক্ষায়...

ফোটো: **প্রীতম চক্রবর্তী** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
(সংগীতশিল্পী)

আমি আঠারো-উনিশ বছর বয়স থেকেই কলকাতায় আছি। কলকাতা ছেড়ে থাকার কথা তো ভাবতেই পারি না। কলকাতার প্রতি একটা অন্যরকম টান তৈরি হয়ে গেছে। গানবাজনা, পড়াশুনো, বন্ধুবান্ধব সবেতেই কলকাতা জড়িয়ে আছে। বাইরে অন্য শহরগুলোতে গেছি অনুষ্ঠান করতে। গেছি, অনুষ্ঠান করেছি, চলে এসেছি। প্রথমে মালদহ থেকে কলকাতায় এসেছিলাম কলেজে পড়তে, তারপর থেকে এ-শহর আমার নিজের শহর হয়ে গেছে। অন্যান্য মেট্রোপলিট্রন সিটিগুলোর মতো কলকাতার মানুষও খুব ব্যস্ত। সময় খুব কম তাঁদের হাতে। তবু তার মধ্যে থেকেই তাঁরা গান-বাজনাকে ভালোবাসে। এখানে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আর একটা ব্যাপার সেটা যদিও একদমই পার্সোনাল সেটা হল আমি পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন, মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে কলকাতার মতো পছন্দসই জায়গা আমার কাছে নেই। আসলে কলকাতার প্রত্যেকটা জায়গাই আমার নখদর্পণে, যেখানে আমার পছন্দের জিনিস পাওয়া যায় তাই কলকাতার মতো কমফোর্টেবল কোথাও ফিল করি না। কলকাতা শহরেই আমার প্রথম পারফরমেন্স তাই এই শহরটার সঙ্গে অদ্ভুত এক ভালোলাগা জড়িয়ে আছে। তবে ভালোলাগা যেমন আছে তেমনি কিছু খারাপ লাগাও আছে। কলকাতার বাঙালিরা এখন খাঁটি বাংলায় কথা বলে না। বাঙালি-অবাঙালি বোঝাটা খুব মুশকিল। এটাই খারাপ লাগার আমরা নিজেদের আলাদা করতে পারলাম না বাঙালি বলে। বাংলা ভাষা মানেই তো এখন এক লাইনে চারটে হিন্দি আর পাঁচটা ইংরেজি। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানেও আমরা হিন্দি বা ইংরেজি বলি, হয়তো সেখানে স্টেটাসের প্রসঙ্গ আসে! কলকাতা মানে যে একটা বাঙালিয়ানার ব্যাপার সেটা কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার পলিউশন অনেকটা বেড়ে গেছে। তবে সরকার থেকে চেষ্টাও করা হচ্ছে, পুরনো গাড়ি বদল করে নতুন গাড়ি আনা হচ্ছে। তবে জ্যাম অনেক কমে গেছে, অন্তত আমি সাউথ ক্যালকাটায় থাকি এখানে তো তেমন জ্যাম হয়ই না বললে চলে। এদিকে-ওদিকে যা ঘটনা শুনি তাতে মনে হয় অনেক শহরের থেকে কলকাতা অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

তবু কারও কাছে ওরা উপহাসের

সোমনাথ আদক

কানে হেডফোন। গান বাজছে, 'হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে...।' ট্রেন চলছে বজবজ থেকে নুঙ্গি, নুঙ্গি থেকে আকড়া, সন্তোষপুর...। জানালার ধারে বসে আছি। বাতাসে যেন লু বইছে। একে তো গরম, তার ওপরে আবার রবিবারেও অফিস থেকে ফোন করে ডেকেছে। অগত্যা দুপুরের খটখটে রোদ মাথায় নিয়ে চাকরি বাঁচাতে চলেছি। আসলে আমরা যারা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি, তারা চাকরি করি না; চাকরি বাঁচাই। সোম থেকে শনি ট্রেনে-বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে যারা যাতায়াত করি তাদের কাছে রবিবার মানে তো শুধু একটা ছুটির দিন নয়–একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচার দিনও। আর এই একটামাত্র ছুটির দিনে অফিস যেতে হলে কারই-বা মেজাজটা ঠিক থাকে!

তবে ছুটির দিন বলে আজ ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকাই। ব্রেসব্রিজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছরের দুটো ছেলে-মেয়ে উঠেই রিমোটে মিউজিক চালিয়ে মাইক্রোফোন হাতে গান শুরু করলো। বেশ ভালো চেহারা, চোখ-মুখ, সাজপোশাকে কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের ছাপ নেই। তাও কেন ট্রেনে গান গেয়ে সাহায্য চায় এরা?

একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে, গান চলছে আর কম্পার্টমেন্ট জুড়ে চলছে হাসিঠাট্টা-বিদ্রূপ। মাঝে-মাঝে গান থামিয়ে ওরা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছে, 'আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের গান ভালো লাগলে দয়া করে কিছু সাহায্য করবেন।' পাশ থেকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একজন তো বলেই দিলেন পাশের জনকে, 'দেখেছেন দাদা আজকাল মাইক্রোফোন নিয়েও ট্রেনে ভিক্ষা করে। ভিখারিরাও জাতে উঠে গেল মশাই।' পাশের লোকটি বলল, 'শরীর–স্বাস্থ্য দেখে তো ভিখিরি বলে মনে হয় না, তা বাপু খেটে খেতে পারো না?' উলটোদিক থেকে কে বলল, 'স্বভাব–স্বভাব। ভিক্ষে করবে আর নেশা করবে।'

হাসি ঠাট্টা, উক্তি-কটূক্তিগুলো যখন উড়ে আসছে ঠিক

তখনি আমার উলটোদিকের মাঝবয়সি ভদ্রলোকটি পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে মেয়েটার হাতে দিল। মেয়েটা দশ টাকার দশটা কুপন কেটে মিষ্টি হেসে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যেতেই বাকি লোকেরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওই ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক তখন তির্যক হেসে বললেন, 'ওরা ভিখারি নয়, কলেজে পড়ে। ছুটির দিনে ট্রেনে গান করে ওদের মতো করে কিছু দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। তবু কারও কাছে ওরা উপহাসের, কারও কাছে বিরক্তির।'

বালিগঞ্জে সব যাত্রীকে ধন্যবাদ ও শুভযাত্রা জানিয়ে যখন ওরা নেমে গেল তখন অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা নিয়ে সারা কম্পার্টমেন্ট তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল তার নিজের মতো। স্বার্থপর পৃথিবী ছেড়ে যেন একটা নিঃস্বার্থ পৃথিবীর দিকে...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

হাটের ধারাবাহিকতায় গালিফ স্ট্রিট

সায়ন রায়

কলকাতা মানেই বিচিত্র জিনিসের সমাহার। কলকাতা মানে প্রতিনিয়ত শহরটাকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশা। এসপ্ল্যানেডের ঘড়ি থেকে ফাইভ পয়েন্টের নেতাজি– এই শহরের প্রতিটি স্মৃতি ও ঐতিহ্য শহর নিজেই আদরের সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছে। অনেকে বলে কলকাতা সৌন্দর্যের শহর, কেউ-বা বলে এটা ভালোবাসার শহর কিন্তু আমার মনে হয়, কলকাতা স্বপ্নের শহর— নিজেও স্বপ্ন দেখে আর আমাদেরও দেখায়। এই যেমন ধরুন গালিফ স্ট্রিট। উত্তর কলকাতায় অবস্থিত এই পেট মার্কেটে আপনি এমন কোনও পাখি, মাছ, কুকুর বা খরগোশের প্রজাতি নেই যা টাকার বিনিময়ে পাবেন না। রাস্তাটি সপ্তায় ৬ দিন খোলা থাকলেও, রবিবার দিন সকাল থেকে দুপুর অবধি বন্ধ। কারণ একটাই— গালিফ স্ট্রিটের বিখ্যাত বাজার যা শুরু হয় ভোর সাড়ে চারটেতে এবং ভাঙে দুপুর তিনটে নাগাদ। এমন রাস্তাও কলকাতার বুকে আছে। এই বিরল সমাগমের সম্পর্কে আপনি জানুন বা না জানুন, বছরের পর বছর ধরে, একইরকমভাবে, আয়োজিত হয়ে আসছে এই রবিবাসরীয়। বদলেছে বলতে সময়ের রূপরেখায় রাস্তাজুড়ে বাজারের পরিধি আর পরিকাঠামো।

গালিফ স্ট্রিটকে প্রায় সকলেই ‘পশুপ্রেমীদের স্বর্গ’ বলে ডাকে। কিন্তু একে যে পুরোদস্তর পশু বিক্রয়ের বাজার বললেও চলে না! এখানে আপনি বাহারি ফুলের গাছ, বনসাই, টব, খাঁচা, পশুদের খাদ্য, মধু, ব্যাগ, বস্তা, মাটি, বাসন, প্লাস্টিকের দ্রব্য থেকে শুরু করে সবকিছুই পাবেন। আপনি যদি মনে করেন যে থাকার আস্তানাটিকে স্বপ্নের রাজ্য বানাবেন, গালিফ স্ট্রিট আপনাকে না চাইতেই সমস্ত উপকরণ দিয়ে দেবে। পকেটে টাকা আর বুকের ভেতর ইচ্ছে থাকলে আপনি হাটের রাজা থেকে আক্ষরিক রাজা হয়ে ফিরতে পারবেন। তবে রাজা? এখনকার দিনে রাজা শব্দটা বেশ পুরনো মনে হয় না? মনে হওয়াটাই উচিত। আসলে গালিফ স্ট্রিট তো নিজেও বহুযুগ-পুরোনো এবং তার নামকরণের ইতিহাস অস্পষ্টতার চাদরে মোড়া। সার্কুলার ক্যানেলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এই রাস্তাটি এক সময় চিৎপুর রোডের অংশ হিসাবে ধরা হতো। সার্কুলার বা বেলিয়াঘাটা ক্যানাল ইংরেজদের এক বিখ্যাত আগমনস্থল কারণ তখন এটি হুগলি নদীর শাখা ছিল। অনেকে বলেন জব চার্নক নাকি এখান থেকেই কলকাতায় প্রবেশ করেছিলেন। ১৮০০ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ক্যানেলের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখনকার রাজ্য পুলিশ আধিকারিক জে এফ গালিফ-কে। হয়তো সেই জন্যেই আজকে রাস্তাটির নাম ‘গালিফ স্ট্রিট’।

শুধু কলকাতা বলেই নয়, গালিফ স্ট্রিটে লোক আসেন পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও। পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে বড় অলংকারসমৃদ্ধ মৎস্য বাজার বলা হয় এই পোষ্য পণ্যবীথিসংবলিত রাস্তাটিকে। নতুন করে কিছু পোষার শখ হলেও গালিফ স্ট্রিটে তা পূরণ করতে পারবে। রাস্তাটির দু’পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকান আর তাদের সাজিয়ে তোলার সমস্ত দ্রব্য যেমন রঙিন পাথর, ছোট্ট ফ্যান, মাছেদের বাড়ি। কিন্তু সাবধান, আপনি এখানে প্রতিটি মুহূর্তে পুলিশের কড়া নজরে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন। গালিফ স্ট্রিটে একটু খুঁজলেই এমন অনেক পাখি এবং পশু পাবেন যা কেনাবেচা করা অবৈধ। এইসব প্রজাতিগুলি বিপন্ন বলে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এদের নিয়ে ব্যবসা করা বেআইনি, নিষিদ্ধ। তাই কেনার আগে প্রাণীটি সম্বন্ধে ভালো করে জেনে নেওয়া আপনার দায়িত্ব।

এমনি কত রাস্তা, কত ইতিহাসে মোড়া কত বিচিত্র তাদের গল্প। তাই তো একথা মানতেই হবে কলাকাতা শহর মানে প্রতিদিন নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশা।

এক আশ্চর্যের স্বপ্নপুরী: মার্বেল প্যালেস

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবু-সংস্কৃতি আসলে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে শহুরে বাঙালিদের মধ্যে উদ্ভূত এক সংস্কৃতি। তা যেমন বিপুল বিলাস-বৈভবের কথা মনে করিয়ে দেয় তেমনি অনেক ক্ষেত্রে অসাধারণ সৌন্দর্যচেতনা ও রুচিশীলতার কথাও বলে। এই আবহে অনেক ধনী জমিদার ও অভিজাত বাঙালি গড়ে তোলেন অসংখ্য সুরম্য ভবন, প্রাসাদ ও বাগানবাড়ি। উত্তর কলকাতার চোরবাগান অঞ্চল সেরকমই একটি প্রাসাদ পেয়েছিল। এলাকার নামটিও এসেছে সেই সময়কার চোর-ডাকাত ও লেঠেলদের প্রতিপত্তি ও কার্যকলাপ থেকে। এলাকা সম্বন্ধে সেই ধারণার অবসান করতেই যেন তৈরি হয়েছিল অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শিল্পচেতনা সমৃদ্ধ এক প্রাসাদ— মার্বেল প্যালেস।

এটি কলকাতার এক বিশেষ দর্শনীয় ভবন। মার্বেল প্যালেস নামকরণ হয়েছে পুরোটাই অত্যন্ত মূল্যবান মার্বেল পাথরে তৈরি বলে। ঠিকানা ৪৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট। উত্তর কলকাতার এই বিখ্যাত প্রাসাদটিতে মার্বেল পাথরের মেঝেতে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর সব নকশার কাজ। দেওয়াল জুড়েও তাই। রয়েছে অসাধারণ নানান তৈলচিত্র, কাচের সুন্দর সুন্দর আসবাব ও শিল্পসামগ্রী এবং অপূর্ব সুন্দর সব মূর্তি। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক এই প্রাসাদ তৈরি শুরু করেন ১৮৩৫ সালে। নকশা করেন এক ফরাসি স্থপতি। শেষ হতে সময় লাগে ৫ বছর। বলা হয়, পাঁচ হাজার মিস্ত্রি পাঁচ বছর খেটে প্রাসাদটি তৈরি করেছেন। ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও চিন থেকে আনা হয়েছিল বহু স্থাপত্যশিল্পী ও কারিগর। ইতালির স্থপতিরা করেন মার্বেল ফ্লোরিং। ফরাসিরা করেছেন লে-আউট, ভেসটিবিউল, পোর্টিকো ও বাড়ির সামনের অংশ। ইংরেজ কারিগররা করেন আসবাবপত্র ও অন্যান্য ফিটিংস। এই তথ্যের উল্লেখ আছে দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি’ গ্রন্থে।

ভবনটির স্থাপত্যরীতি নিওক্ল্যাসিকাল। বাঙালি রীতিও উপেক্ষিত নয়। সামনের দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আর ভিতরের ঠাকুরদালান তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঠাকুরদালানে এখনও কালীপুজো ও সরস্বতী পুজো হয়। ভিতরের দিকের বারান্দাগুলিতে নানান প্রজাতির পাখির সংগ্রহ আছে। তবে বাড়ির যে-অংশে পরিবারের লোকেরা থাকেন সেদিকে যাবার অনুমতি নেই।

ভবনটির অভ্যন্তরে এক অচেনা আশ্চর্যময় জগৎ। যেন স্বপ্নপুরী। শ্বেতপাথরের অসংখ্য ভাস্কর্য। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট থেকে জর্জ ওয়াশিংটন। গ্রিক ও রোমান পুরাণের দেবদেবী, জিউস, মিনার্ভা, অ্যাপোলো, ভেনাস— সবাই আছেন। সবাইকে জীবন্ত মনে হবে। ঢুকতেই হলের মাঝখানে এক বিশাল বিলিয়ার্ড বোর্ড, পাশে ব্রোঞ্জের একটি Dancing Girl-এর সুন্দর স্ট্যাচু। অবাক করে দেয় রানি ভিক্টোরিয়ার একটি প্রমাণ সাইজের স্ট্যাচু যেটি একটি গোটা কাঠের খণ্ড থেকে তৈরি।

বিশাল আকৃতির মিউজিক হলে রয়েছে ইন্ডিয়ান গ্র্যান্ড পিয়ানো। শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ আর বসন্ত চারটি ঋতুর পরিচায়ক চারটি অপূর্ব ব্রোঞ্জ মূর্তি আর একটি বিরাট আকারের চাইনিজ ধুনুচি। আর রয়েছে পাঁচটি ঝাড়বাতির সঙ্গে দারুণ সুন্দর আটখানা বেলজিয়াম গ্লাসের বাতিদান ও নানারকমের বাদ্যযন্ত্র। ঠাকুরদালানের সামনের লনে রয়েছে চার মহাদেশের নামে চারটি স্ট্যাচু— এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ আর আমেরিকা।

দোতলায় পেইন্টিং রুমে রয়েছে বিশাল বিশাল ক্যানভাসে আঁকা অসংখ্য পেইন্টিং। ষোড়শ শতকের বিখ্যাত জার্মান শিল্পী রুবেনস-এর আঁকা দ্য ম্যারেজ অব সেন্ট ক্যাথেরিন আর ইংরেজ শিল্পী স্যার জোশুয়া রেনল্ড-এরও দু’টি মূল চিত্রকর্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পোর্ট্রেটটিও নজর কাড়ে। অত্যন্ত দামি কিছু কার্পেট মুড়িয়ে রাখা আছে। এছাড়া রয়েছে

নানারকম সাইজের ঘড়ি, যার মধ্যে Grandfather Clock নামে বিশাল ঘড়িটি এখনও চালু আছে এবং সময়মত ঘণ্টাও বাজে।

Dancing Room বা নাচঘরে দুদিকে দুটি বেলজিয়াম গ্লাসের প্রকাণ্ড আয়না আছে, লম্বায় একেবারে মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত। ভিক্টোরীয় যুগের কাঠের ও পাথরের প্রচুর আসবাবপত্র, অনেকগুলি গোলাকৃতি সোফা যার এক-একটিতে বৃত্তাকারে পাঁচজন করে বসতে পারে। আছে স্বচ্ছ পাথরের একটি বড় আকারের ফুলদানির মতো বস্তু। দোতলায় বিশাল আকারের মিটিং রুমটি এখন দর্শকদের জন্য বন্ধ আছে, সেখানে মেরামতির কাজ চলছে।

বাড়ির দেওয়াল ও মেঝের মার্বেল, তার নকশা, এবং সিঁড়ি ও আসবাবপত্র সবকিছুতেই এমন অসাধারণ রুচি ও শিল্পবোধের ছাপ রয়েছে, যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আর সমস্ত বাড়িটাই যেন একটা আর্ট গ্যালারি। কত যে মূর্তি আর পেইন্টিং তা দেখে শেষ করা যায় না। কত রকমের যে ভেনাস মূর্তি তা না দেখলে অনুমান করা যায় না। এতসব অমূল্য শিল্পসংগ্রহ বংশানুক্রমে পরিবারের লোকজন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবক্ষেণ করে চলেছেন যা ভাবতে আশ্চর্য লাগে এবং এখন ছয়পুরুষ ধরে চলছে এই ব্যবস্থা। বর্তমানে একটি ট্রাস্টের হাতে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত আছে।

এই ভবনটির সুবাদেই কলকাতা পেয়েছিল তার প্রথম চিড়িয়াখানা যেটি বাড়িটির সামনের বাগানেই অবস্থিত। সবুজ লনের উপর দিয়ে অজস্র গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিস্তৃত চিড়িয়াখানায় চিতল হরিণও আছে। তার পাশেই রয়েছে বিশাল খাবার জায়গা যেখানে এখনও প্রতিদিন দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। এলাকার তো বটেই, বহু দূর দূর থেকেও দরিদ্র মানুষজন এসে এই খাবার খান এবং সংখ্যাটা কোনও কোনও দিন পাঁচশো-ছশোও ছাড়িয়ে যায়।

কলকাতার এই বিশেষ দর্শনীয় প্রাসাদটিতে বিনামূল্যেই যাওয়া যায়। তবে একদিন আগে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমতি নিতে হয়। প্রাসাদের কর্মীরাই গাইড হয়ে দর্শকদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন সবকিছু।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

ম্যাটিনি শো-এর বিপ্লবী

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

যদি কোনও ছবিতে দেব আনন্দ থাকতেন তাহলে সেই সিনেমা মা মাসিরা বাদ কখনও দিত না। উনিশশো সত্তর সালের অভাবী মধ্যবিত্ত সংসারে তখন ভাল করে খাওয়া জোটাতে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠবার জোগাড়। কিন্তু হাতে টাকা ছিল না বলে তখন যে মধ্যবিত্তের শখ-সাধ ছিল না, তা কিন্তু নয়। সে-সময় নতুন নতুন সিনেমা দেখা ছিল, ফেরিওলায়ার কাছে কেনাকাটা ছিল, ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া ছিল। সে এমন সময় ছিল যখন বিছানা-তোষক-বালিশ সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে চাপা হত। কারণ ধর্মশালায় তোষক, বিছানার আলাদা ভাড়া লাগত। তাই বেডিং অর্থাৎ বিছানার সব আয়োজন সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরনো হতো। মাল্টিপ্লেক্সের নামই কেউ শোনেনি। কিন্তু সিনেমা দেখতে উপচে পড়ত শহর। উত্তম, সুচিত্রা, রাজেশ খান্না, দেব আনন্দ।

দেব আনন্দের প্রেমে তখন কলকাতার মেয়েরা ওয়াহিদার মতো একটু লম্বা ঝুলের হাতা ব্লাউজ ধরেছে। সেটা ১৯৭১-এর মার্চ। দেবানন্দের একটা ছবি চলছে কলকাতার অনেকগুলো প্রেক্ষাগৃহে। সে ছবিতে দেব আনন্দ শুধু নায়ক তাই নয়, দেব আনন্দ নিজে পরিচালনা করেছেন সেই ছবি। গল্পটাও দেব আনন্দেরই লেখা। ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পেয়ে ছবিটা ভারতের বাজারে সুপার ফ্লপ করেছে। ছবিতে রাজকাপুরের জোর প্রভাব রয়েছে কিন্তু গল্পের খেই রাখতে পারেননি দেবানন্দ। শুধু বাংলাতে ছবিটা ভালো ব্যবসা করছে মূলত তিনটি কারণে। একটা কারণ পর্দা জুড়ে দেবানন্দের উপস্থিতি। আর একটা হল শচীন কর্তার অসাধারণ সুরের কটা গান। আর তৃতীয় কারণ ছবিটার বেশিরভাগটা শ্যুটিং হয়েছিল সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন অপরূপ লোকেশনে তাই শুধু দৃশ্য দেখবে বলেই ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি ছবিটাকে ব্যবসা দিচ্ছিল। কলকাতাতে সিনেমাটা বেশ রমরমিয়েই চলছিল।

আমি তখন ক্লাস এইট। বাড়ির বড়দের সঙ্গে সব সিনেমায় যাবার অনুমতি তখনও মিলত না। তবু মা পিসি মাসিরা ঠিক করল যে তারা সেদিন যে সিনেমাটা দেখতে যাবে সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়াই যায়। কারণ সিনেমাটার নাম 'প্রেম পূজারি' হলেও পাড়ার কাকিমাদের একটা দলের কাছ থেকে জানা গেছে যে ওই সিনেমাটায় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আর ভারত-চিন যুদ্ধই বেশি দেখানো হয়েছে। 'প্রেম পূজারি'তে প্রেমের সিন প্রায় নেই বললেই চলে। কাকিমারা বললেন, সিনেমাটায় দেখবার বলতে আছে শুধু 'সিনসিনারি' অর্থাৎ নৈসর্গিক দৃশ্য। ফলে বাড়ির স্কুলে পড়া মেয়েকে সঙ্গে নেওয়াই যায় বলে বড়রা স্থির করলেন।

উত্তর কলকাতার প্রসিদ্ধ সিনেমা হলের সামনে সেদিন লম্বা লাইন। টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে লাইনের সামনেই। আমাদের অবশ্য লাইন দিতে হল না। দু'দিন আগে পাড়ার এক কাকা টিকিট কেটে দিয়ে গিয়েছে। আর্মি অফিসারের ছেলে দেব আনন্দ জিম করবেটের মতন পোশাক পরে পর্দায় দূরে পাহাড়ের রেখার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ছেলেরা সিটির পর সিটি দিচ্ছে, হল সিটিতে সিটিতে ভেঙে পড়বে যেন। মা মাসিরা কঠিন মুখে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। যেখানে এত পুরুষের সিটি শোনা যায় সেখানে আমাকে বুঝি না আনলেই ভাল ছিল। দেবানন্দ ভারত-চিন সীমান্তে গিয়ে ধরা পড়ছে চিনের মিলিটারির হাতে। আর্মি অফিসারের ছেলে হলেও দেবানন্দ এদিকে রাষ্ট্রনীতির কিছুই বোঝেনা সে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গিয়েছে স্রেফ জঙ্গল আর 'জংলি জানোয়ার' ভালোবাসে বলে। কিন্তু চিনের সেপাইরা তা শুনবে কেন? তুমি সীমান্তের কাছাকাছি ঘুরঘুর করবে সেটা কোন দেশের সেপাইরাই বা মানবে? চিনের মিলিটারি তাই দেবানন্দকে উদোম পেটাচ্ছে। একেবারে ফেলে মারা যাকে বলে। কিল, চড়, ঘুঁসি। সিনেমাহল কবরখানার মত নিস্তব্ধ। দেবানন্দ মার খাচ্ছে আর রক্ত পড়ছে যে! মেয়েরা আঁচলে চোখের জল মুছছে।

এমন সময় হঠাৎ ভয়ানক জোরে একটা শব্দ হল। কানের পর্দা যেন ফেটে যাবে এত জোর সেই শব্দের। ভয় চেঁচিয়ে উঠল সকলে। সিনেমার ভেতর থেকেই কি এল ওই বিকট শব্দ? পরক্ষণেই আবার একটা বিকট আওয়াজ। শব্দের সঙ্গে এবার হলের ভেতর গলগল করে ছুটে এল গরম ধোঁয়া। আগুন আগুন করে সকলে চিৎকার করে উঠল। সিট ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই। কে কার আগে ছুটে

পালাবে সেই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমরাও আসন ছেড়ে উঠে পড়েছি। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে আমার পিসি। সেইসময় মড়মড় করে হলের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে এল দশ-বারোজন যুবক। তাদের হাতে বন্দুক। দু-একজনের হাতে বোমা। একজনের হাতে মশাল। তারা উন্মত্ত হয়ে চেঁচাতে লাগল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ। পুঁজিবাদের দালালকে খতম করো, খতম করো। চিনের গায়ে কাদা ছেটানো চলবে না চলবে না। ভারতের দালাল-শ্রেণিশত্রুর সিনেমাহলে আগুন দাও। জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।

ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে। আমরা তাহলে বেরোব কীভাবে? হল এদিকে ভরে গিয়েছে ধোঁয়ায়। আমরা কাশছি খুব। 'প্রেম পূজারি'র দেব আনন্দ যেমন ভারত-চিন কিছু জানত না। শুধু জঙ্গলকে ভালোবেসে সে দু-দেশের সীমান্তে চলে গিয়েছিল, তেমন আমরাও ম্যাটিনি শো-কে ভালোবেসে ভারত-চিন দ্বৈরথের সীমায় দাঁড়িয়ে কাশতে লাগলাম।

হলের ম্যানেজার এমারজেন্সি একজিট খুলে দিলেন। খুলে দেওয়া হল সিনেমা হলে ঢোকবার অন্য দরজাটাও। আমরা বেরিয়ে এলাম হল থেকে। বাইরে এসেও দেখি স্লোগান স্লোগানে পরিস্থিতি ছয়লাপ। কেউ কেউ বলল সিনেমাহলটা বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমরা যতটা পারলাম জোরে ছুটে সিনেমা হল থেকে কিছুটা তফাতে এসে দেখি দূরে হল থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

পুলিশের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে হলের দিকে। লাঠি নিয়ে পায়ে হেঁটে প্রেক্ষাগৃহের দিকে এগোচ্ছে শ-খানেক পুলিশ।

আমাদের বাড়ি থমথম করছে। বাড়ির মহিলারা বাচ্চা একটা মেয়েকে নিয়ে কোন আক্কেলে সিনেমা দেখে ফুর্তি করতে বেরিয়েছিল সে কথাই ভাবছেন বাড়ির গুরুজনরা। যদি কাল ওই আগুন বোমার মধ্যে বড় কোনও বিপদ হতো, তখন কে সামলাত? সঙ্গে কোনও পুরুষমানুষ নেই! আর একটু-এদিক ওদিক হলে কী হয়ে যেতে পারত সেটাই বলছেন সকলে! গতকাল উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা মিলিয়ে তিনটি সিনেমা হলে গেরিলা আক্রমণ চালিয়েছে নকশালপন্থীবাহিনী। যে হলগুলোয় দেবানন্দের 'প্রেম পূজারি' দেখানো হচ্ছিল সেই হলগুলোর পর্দা বোম মেরে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন নকশালরা। কারণ তাদের মতে 'প্রেম পূজারি' ছবিটাতে চিন-বিরোধী কথা বলা হয়েছে। নকশালদের এই গেরিলা অ্যাটাকের ফলে তিনটি সিনেমা হলের সিনেমা দেখানোর পর্দা সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। হলের দেওয়াল সিলিং নষ্ট হয়েছে। তিনটি হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে। পুড়ে মারা গিয়েছেন একটি হলের একজন কর্মী। কাজ হারিয়েছেন হলগুলির শ-খানেক কর্মচারি। তাছাড়া হলের সামনে পানের দোকান, চায়ের দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ। চায়ের দোকানের সামনে বসা বুড়ো ভিখিরি আরও ক্ষুধাতুর হয়েছেন। হলের সিঁড়িতে ঘুমোত যে নেড়ি কুকুর সে তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বেঘর।

শহরে লক্ষ বেকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও শ-দুয়েক নাম। যারা ওই হলগুলিতে কাজ করতেন তাঁদের যে তারপরে কী হল তা আমরা কেউ জানি না।

শহরে মেয়েদের দুপুরে সিনেমা দেখার ওপর নেমে এসেছে পরিবারের শীতলব নিষেধাজ্ঞা। দেবানন্দের ছবি আসে যায়; অনেক মেয়ে মুখ ফুটে বলতে পারে না যে ম্যাটিনি শো-তে আবার তাদের বেরোতে ইচ্ছে করছে।

যে তিনটে সিনেমা হলে আক্রমণ হয়েছিল তার মধ্যে একটি হল আর খুললই না কোনওদিন। হল মালিকের অনেক ধারদেনা ছিল বাজারে। তিনি ভেবেছিলেনন সিনেমা দেখিয়ে সেখান থেকে লাভ হলে সহজে ধার শোধ করে হল চালাবেন। কিন্তু প্রায় ভস্মীভূত হল সারাবার টাকা তিনি জোগাড় করতে পারেননি। দেনা আর লোকশানের দায়ে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গলায় দড়ি দিয়ে তিনি আত্মঘাতী হন। খুব ছোট করে খবরটা বেরোয় কাগজে।

শহরে 'প্রেম পূজারি'র হলে বিধ্বংসী গেরিলা আক্রমণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল, খবরে খবরে ছয়লাপ হয়েছিল মহানগর। সে তুলনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হল মালিকের দেউলিয়া হয়ে আত্মহত্যার খবরটা শহরে কেউ খেয়ালই করেনি।

তারপর বহুযুগ কেটে গেছে। হাজার হোক শহরের মেয়েদের এখন সিনেমা দেখতে যেতে হলে বাড়িতে অনুমতি নিতে হয় না। মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখবার কত আরাম এখন। কিন্তু সেই একাত্তরে ম্যাটিনি সিনেমা দেখবার জন্যে কষ্ট করে পয়সা জমানো, সিনেমা দেখার সেই আকুল ইচ্ছে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছে মহাকালের গর্ভে। দেব আনন্দের একটা দুরন্ত সংলাপ আছে 'লাগতা হ্যায় আজ হর ইচ্ছা পুরি হোগি লেকিন মজা দেখো আজ কোই ইচ্ছাহি নেহি রহি...' অনেকটা সেইরকম ব্যাপার। নতুন নতুন দামি মাল্টিপ্লেক্স আমাদের সবই দিল অথচ আগেকার দিনের ম্যাটিনি শো দেখার দুর্মর ইচ্ছেটাই কখন যেন হারিয়ে গেল জীবন থেকে।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

বাঙালির কি এখনও পরোটা প্রিয়? নাকি, অন্য কিছু জায়গা করে নিয়েছে হেঁসেলে

অভিমন্যু রায়

পেনটা চালাতে গিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। স্কুল লাইফের কত কথা আজও স্মৃতিতে রয়ে গেছে। আর স্কুলের প্রসঙ্গ এলেই কত শিক্ষকদের কথাও মনে পড়ে। ওই যেমন জ্যামিতি করতে গিয়ে খাতায় অনেক সময় গোলটা লুচির মতো হয়ে যেত, অথবা ভূগোলে ভারতের ম্যাপ আঁকতে গিয়ে পরোটা হয়ে যেত! স্যারের মারটাও বেশ মজার। কান মুলে দিতেন। লেখার শুরুতে এই কথাটা টানার মানে রয়েছে। বাঙালির জলখাবার মানে লুচি-পরোটা। শ্রমিক বাঙালি, মধ্যবিত্ত বাঙালি, বড়লোক বাঙালি— সবার পছন্দের জলখাবারের তালিকায় থাকবেই লুচি কিংবা পরোটা। কেউ দোকান থেকে কিনে খান, কেউ বাড়িতে বানিয়ে। ওই যে ছেলেবেলার আর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। 'লুচি আর চন্দ্রকান্তা'।

লুচি না হয় এক এক জায়গায় এক এক রকম, কিন্তু পরোটা? সে তো গোটা ভারতেই এক। লুচি কোথাও পুরি, কোথাও কচৌরি। বনস্পতি ছিটিয়ে সাদা ময়দার অথবা লাল আটার এই খাবার নিরন্তর ভাজা হয়ে চলেছে।

আজ বাঙালি কি সেই পরোটা বা লুচি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? জলখাবার হয়ে গিয়েছে ব্রেকফাস্ট। উত্তর কলকাতার পরোটার দোকানে আগের মতো সেই ভিড় কি আর দেখা যায়? ব্রেক ফাস্টে এখন গতিময় বাঙালি দু' মিনিটে ম্যাগি খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। রোডসাইড থেকে ধাবা বা পাঁচতারা হোটেল এই একটা খাবার এক পঙ্‌ক্তিতে। উচ্চারণে একটু পার্থক্য। একে 'পরাঠা', 'পরোটা' বা 'পরথা'— যে নামেই ডাকুন, গোলাপের মতোই সে সুন্দর। আর পরোটার শেপ নারায়ণের অবতারের মতো। কোথাও গোল, কোথায় ত্রিভুজ, কোথাও কুচিয়ে আপনাকে প্লেটে করে দেবে। নারায়ণের মতোই তার অনেক অবতার। নারায়ণের মতোই সে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবয়বে বিরাজমান। তবে পরোটা কি কলকাতার, না বাইরে থেকে কলকাতায় এসেছে? যা বাঙালি ভালোবেসে নিজের করলেও এখন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

পরোটার শরীরে মিশে রয়েছে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝনঝন, মুঘল শিবিরে বৈরাম খানের উল্লাস। কিন্তু ইতিহাস জানাচ্ছে, এই মনে হওয়াটা একেবারেই ভিত্তিহীন। পরোটা একান্তভাবেই এক আর্য খানা। এর সমার্থক শব্দ হিসাবে 'সমার্থ শব্দকোষ' হাজির করছে 'পুরোডাশ', 'পূপলা', 'পূপলিকা', 'পূপিকা', 'পুরিকা' এবং 'পৌলি'। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই পদ নেহাতই আর্য। কারণ প্রতিটি শব্দই তৎসম। এর মধ্যে 'পুরোডাশ' শব্দটি বাঙালির একান্ত পরিচিত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে বারবার উল্লেখ রয়েছে শূলপক্ক মাংস আর পুরোডাশের। অভিধান বলছে, 'পুরোডাশ'-এর অর্থ— যবের তৈরি রুটি বা মালপোয়া জাতীয় প্রাচীনযুগের খাবার বিশেষ। এদেশে গমের প্রাক্-পুরুষ ছিল যব। আর শূলপক্ক মাংস দিয়ে আর যাই হোক মালপোয়া টাইপের মিষ্টি কোনওকালেই কেউ খায় না। তাহলে কি অনুমান করে নেওয়া যায় না, এই আর্য পুরোডাশই আজকের পরোটার পূর্বপুরুষ?

তো কাবাবের জন্যই বানানো হয় পরোটা। মানে সাদা ময়দার খাস্তা পরোটা অবশ্যই ইসলামি অবদান। অনেক পরে সেই পরোটাকে বাঙালি জেনেছে 'লাচ্চা' পরোটা হিসাবে। তদ্দিনে বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক রকমের হাওয়া। মোঘল-পাঠান হদ্দ হয়ে পার্সি সংস্কৃতি ধুলোয় লুটিয়েছে। সাহেবরা এদেশে 'নবাব' সাজতে গিয়ে খানা খেয়েছেন মোগলাই ধাঁচে। পরোটা-কাবাব বাঙালি হিন্দুর হেঁসেলে না ঢুকলেও তা আলো করে ছিল মোজাইক চমকানো ইসলামি হোটেল। সে ভারি আশ্চর্য সময়। ১৯ শতকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর রসরাজ অমৃতলাল পিরুর হোটেলে কাবাব খেতেন বলে সমকালীন সাহিত্য সাক্ষ্য দিলেও তার সঙ্গে পরোটা থাকত কিনা জানা যায়নি।

বাঙালির জলখাবারের পাতে পরোটা আদৃত হলেও হিন্দু বাঙালি তাকে স্থান দেয় লুচির পরেই। বাঙালি কহাবতেই তার প্রমাণ। ভেবে দেখুন, কথার মাত্রায় 'লুচি-পরোটা'-ই আসে। কেমন যেন মনে হয়, লুচি না হলে পরোটা। কিন্তু, বাঙালি মুসলমান পরিবারে লুচির চল কম। পরোটাই সেখানে মেনস্ট্রিম। তবে অবাঙালি সংস্কৃতির ক্রমাগমনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আজ আলুর পরোটা, গোবি পরটায় অভ্যস্ত; আজবায়ন বা মেথি পরোটাতেও বটে। বিয়েবাড়ির লাউড স্পিকারে তখন মানবেন্দ্র-সতীনাথ মুছে গিয়ে 'কয়ি ধুঁয়া আহা নাচে নাচে'। সনাতনপন্থীরা খেপে গিয়ে লাচ্চা পরোটাকে 'লোচ্চা পরোটা' বলে ডাকতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁরা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, আর কয়েক বছরের মধ্যে লাচ্চা পরোটার নামে বাঙালির নাল-ঝোল গড়াবে। স্পেনসার্স বা তদ্রূপ বিপণি থেকে রেডি টু কুক প্যাকেটবন্দি লাচ্চা বাড়িতে এনে ভেজে খাওয়াকে বিলাসিতার হদ্দমুদ্দ মনে করা হবে।

কিন্তু পরোটার জায়গাটা কি সংসারে একই রয়েছে? মনে হয় না। আগে তো বিয়েবাড়িতে লুচি দেওয়া হতো। বানানো হতো পরোটাও। এখন সে সব হয় না। এখন বাঙালির বিয়েতে বা যে কোনও অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়েছে নানা রকমরে খাবার। বেবি নান, রুমালি আরও কত কিছু। রেস্তোরাঁতেও এখন গিয়ে কেউ পরোটা খোঁজে বলে তো মনে হয় না!

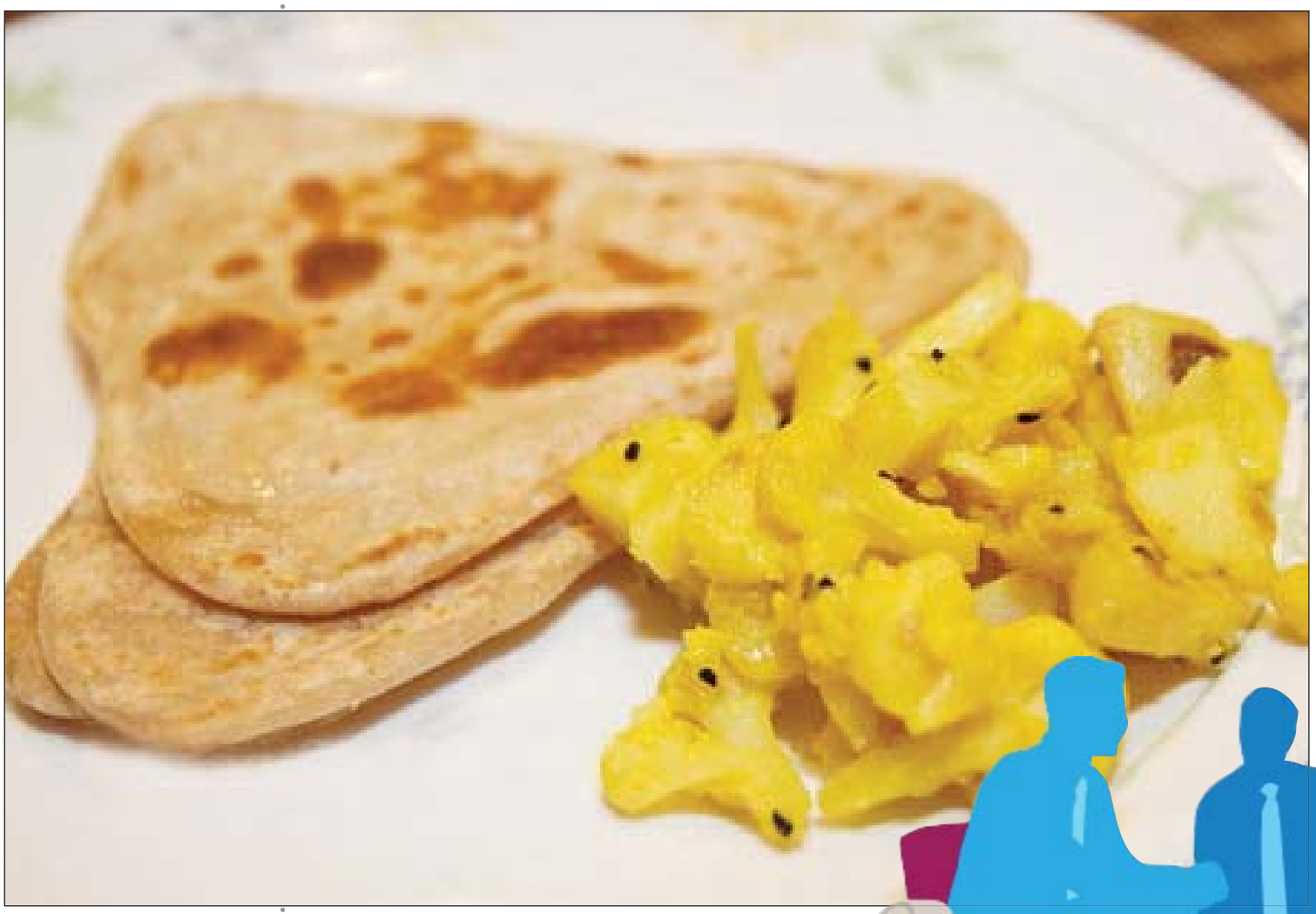

পরোটা সব জায়গায় পরোটাই। আসমুদ্র হিমাচল এই একটি ডিশই বোধহয় কমন। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম 'আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার,' পরোটা হি পরোটা এই দেশে। নামে সামান্য হেরফের আর রেসিপিতে হালকা বদল, তার বাইরে কোনও ফারাক নেই বাঙালির হেঁসেলে আর কাশ্মীরি পাকশালে। গরম তাওয়ায় ঘি বা

এখান থেকে অনেকেরই ধারণা হতে পারে, পরোটা একটি বহিরাগত খানা। মনে হতেই পারে মোঘল আমলে সমরখন্দের শুকনো পাথুরে জমি থেকে পরোটা আমদানি হয় সুজলা-সুফলা গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদার দেশে। মনে হতেই পারে

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

নদীমাতৃক কলকাতা

ঝুমা দাস মল্লিক

হুগলি নদী— কলকাতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো একটা নাম। অবশ্য শুধু নাম বললে ভুল হবে। হুগলি নদী না থাকলে কলকাতাও তৈরি হতো না। বহতা মাঝনদীতে ভাসমান নৌকা থেকে দেখতে পাওয়া কলকাতার আত্মদৃপ্ত রূপ বড় সুন্দর। সভ্যতার উজ্জ্বল আলোয় সান্ধ্য—কলকাতা ঘোষণা করছে নিজেকে। অথচ এই রূপময় শহর তো একদিনে তৈরি হয়নি। হিজলিতে পানীয় জলের অভাব না থাকলে সেদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের বসতি তৈরি করত সেখানেই।

জব চার্নকের কলকাতার পশ্চিমে নদী আর পূর্বে জঙ্গল। দক্ষিণে আদিগঙ্গা আর গোবিন্দপুর গাঁ। সুতানুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুরের গঞ্জকেন্দ্রিক কলকাতা তখন অতি অস্বাস্থ্যকর। সোঁদামাটি থেকে উপচে উঠত বাষ্প। ইংরেজ কবি অ্যাটকিনসন অন্তত তেমনি বর্ণনা দিয়েছেন। তবু বণিক ইংরেজের তীক্ষ্ণ নজরে ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা। তখন কলকাতায় জমি পাওয়া যেত জলের দরে। শিমলে অঞ্চলে কাঠা ১০ টাকা, কুমোরটুলিতে কাঠা এগারো টাকা। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা এসব।

তবে কলকাতাকে শুধু ইংরেজই চেনেনি, চিনেছিল আরও অনেকেই। যেমন আমেরিকার কথাই বলা যাক। সদ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের আঁচ পেরিয়ে আমেরিকা তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে নতুন উপনিবেশ। কারণ তারা তাদের পুরনো জমি হারিয়েছিল। সেই সময় নেপোলিয়নের যুদ্ধ, ব্যস্ত করে রেখেছিল ব্রিটিশ জাহাজগুলোকে। ১৭৭০সাল। হুগলি নদীর জল কেটে এগিয়ে আসছে HYDRA জাহাজ। আমেরিকানরা এবার বণিক। মোটামুটি ১৭৯০ সাল থেকে ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করল আমেরিকা। বছর বছর বাড়তে লাগল জাহাজের সংখ্যা। ক্রমে দেখা গেল বছরে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটার মতো জাহাজ আসছে আমেরিকা থেকে। বোস্টন, সালেম, ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক বিভিন্ন জায়গা থেকে আমদানির জন্য আসত জাহাজ। চা, চিনি, নীল, ভারতীয় কাপড় আমদানি করত তারা। সারা বাংলা থেকে কলকাতায় আমদানি হতো এইসব জিনিস। চাল, তিল, তেল, মরিচ, আদা, তসর, সুতিবস্ত্র— এসবও আমদানি হতো এই বন্দরে। জানা যাচ্ছে ১৯০১-'০২ সাল নাগাদ এই আমদানির অর্থমূল্য ছিল বছরে প্রায় ঊনপঞ্চাশ কোটি টাকা। এই সমস্ত আমদানিকৃত জিনিস রপ্তানি হতো বিদেশে। ১৮০৬ সাল নাগাদ বছরে তিন লক্ষ মিলিয়ন ডলারের জিনিসপত্র আমদানি করছিল আমেরিকা।

তবে আমেরিকা শুধু আমদানি করত না, রপ্তানিও করত। তাদের আনা জিনিসপত্র ছিল ডলার, লোহা, দস্তা, ব্র্যান্ডি, বিয়ার ও আরও নানারকম মদ, সামুদ্রিক মাছ এবং বরফ। এই বরফ নিয়েই শোনা যাচ্ছে আর এক কাহিনি। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে ইংরেজের কাছে বরফের অনেক চাহিদা ছিল। এজন্য তাদের নির্ভর করতে হতো হুগলি আইস-এর ওপর। হুগলির চুঁচুড়ায় দেশি পদ্ধতিতে বরফ তৈরি করা হতো। তবে সেই বরফ ইংরেজের পছন্দ ছিল না। চুঁচুড়া থেকে হুগলি নদীপথে চল্লিশ কিমি পথ পেরিয়ে সেই বরফ আসত কলকাতায়। তবে ইংরেজকে নিজেদের পরিচিত বরফের স্বাদ এনে দিলেন এক অ্যামেরিকান। বোস্টনের ব্যবসায়ী ছিলেন ফ্রেডারিক টুডোর। তিনি এদেশে বরফের ব্যবসা শুরু করলেন চূড়ান্ত মাত্রায়। ১৮৩৩ সালে তিনি ১০০ টন বরফ এনেছিলেন। ১৮৪৭ সালে সেই মাত্রা ৩০০০ টনে পৌঁছয়। এই 'ম্যাসাচুসেটস আইস' থেকে কুড়ি বছরে টুডোর লাভ করেছিলেন ২২০,০০০ ইউএস ডলার।

তবে শুধু বিদেশিরাই নয় লভ্যাংশ পাচ্ছিলেন এদেশীয়রাও। আমেরিকানরা এখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যবসা করছিল না। সেসময় কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এজেন্সি হাউস ছিল প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা। কিন্তু আমেরিকানরা কোনও এজেন্সি হাউস এখানে খোলেনি। তাদের ব্যাবসার মাধ্যম ছিল এদেশি বেনিয়ারা। রামদুলাল দে, আশুতোষ দে, প্রমথনাথ দে, রাজেশ দত্ত, কালিদাস দত্ত, রাজকৃষ্ণ মিত্র, রাধাকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ এই আমেরিকানদের বেনিয়ার কাজ করে রীতিমতো সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। আর একজনের নাম করতেই হয়। মতিলাল শীল। কলকাতার সেরা কুড়িটি এজেন্সি হাউসের বেনিয়া ছিলেন তিনি। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সে যুগের স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তিত্ব। বোঝাই যাচ্ছে বন্দর ও নদীপথ শুধু বিদেশি নয়— বাঙালিদের উপরও আশীর্বাদ সিঞ্চন করছিল।

শুধু এটুকুই নয়। নদী এ-শহরের প্রাণের দোসর। সে রচনা করেছে শহরের বেড়ে ওঠার ইতিহাস। আজকের কলকাতা বহুমাত্রিক। শুধু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নয়— আরও বহু দেশের মানুষের ঠাঁই আজ কলকাতা। শুনব তেমনই এক ইতিহাসের কাহিনি। প্রায় আড়াইশো বছর আগের কথা। অষ্টাদশ শতক। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন দাপিয়ে শাসন করছেন কলকাতা। এমনই সময়ে একদিন হুগলি নদীর তীরে বজবজের কাছে এসে থামল জাহাজ। নামলেন চিনা ব্যবসায়ী— Tong Achew। তাঁর ছিল চা-এর ব্যবসা। কিন্তু কলকাতা সে ব্যবসায় অনুকূল নয়। তিনি স্থির করলেন চিনির ব্যবসা করবেন। আখচাষের উপযোগী আবহাওয়া এবং সঙ্গী স্বদেশিদের সম্মতি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে চাষের জন্য জমির আবেদন করলেন তিনি। হেস্টিংস সম্মতি দিলেন। বজবজের দু'মাইল দক্ষিণে বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া গেল ছ'শো পঞ্চাশ বিঘা জমি। সেখানে তিনি নিজের দলবল নিয়ে শুরু করলেন আখচাষের কাজ। পাশে তৈরি হল সুগার মিল। অবশ্য Tong—এর মৃত্যুর পর এই উদ্যোগ থেমে গেল। অন্যান্য চিনারা ছড়িয়ে পড়লেন কলকাতায়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল চায়না টাউন। Tong Achew-র নামটা শুধু বাঁচিয়ে রাখল স্থান নাম—আছিপুর।

নদী শুধু বন্দরের মাধ্যমেই কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখেনি, জুগিয়েছে এ-শহরের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জলটুকুও। কলকাতার প্রথম যুগে বৈষ্ণবচরণ শেঠ এই নদীর জলের ব্যবসা করেই ধনী হয়েছিলেন। বিদেশেও তিনি রপ্তানি করতেন গঙ্গার জল। সে যুগের ডালহৌসি স্কোয়ারে ছিল পাকা নালা। গঙ্গার জলকে পাইপে করে শহরের এইসব পাকা নালায় ফেলা হতো। বলদ আর ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কাঠের পিপে ভর্তি করে জল যেত ধনীগৃহে। দরিদ্র মানুষ মাটির কলসি ভরে নিতেন পাকা নালা থেকে। তবে সাহেবরা এই হুগলি নদীর অপরিশুদ্ধ জল পান করতেন না। নদীতে ভাসত বেওয়ারিশ মৃতদেহ। ভেসে যেত ময়লা ও বিষ্ঠা। ঘরোয়া পরিস্রুতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে নদীর জলকে শোধন করে ব্যবহার করতেন মানুষ। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে নদী থেকে জল তোলার জন্য একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন বসানো হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সাল থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম পাম্পিং ব্যবস্থা চালু হয়।

সময় এগিয়েছে। সেই গতিপথে বদলেছে কলকাতা। আধুনিকতার স্পর্শ তার পরতে পরতে। তবে আজও মহালয়া কিংবা অন্য পুণ্যতিথিতে পুণ্যার্থীদের ভিড় দেখে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি কলকাতার মন আধুনিক হয়েছে? কারখানার ময়লা, পশু ও মানবদেহের ময়লায় পূর্ণ নদীর জল আজও সে যুগের মতোই পুণ্য বারি। নদী অপরিহার্য। শহরের আধুনিকতম যাতায়াত ব্যবস্থায় পাশে নদীর ফেরি ব্যবস্থা আজও যাতায়াতের বড় মাধ্যম। কলকাতা বন্দর তার নাব্যতা হারিয়েছে। তবে নদীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েই বেড়ে উঠছে, আধুনিক হচ্ছে মেগাসিটি কলকাতা। আর নদীপথে তার বাণিজ্য স্মৃতির রেশটুকু ধরে রেখেছে খিদিরপুর।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

নিউ থিয়েটার্সের পরিচালকবর্গ

শৈবাল পত্রনবীশ

যাঁর কথা বলব তিনি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে জীবন শুরু করেছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট নামডাক ছিল তাঁর। ঘটনাচক্রে তিনিই আবার নিউ থিয়েটার্সের হাতিমার্কা ব্যানারে প্রথম চিত্রপরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলেন। অনেকেই জানেন না প্রেমাঙ্কুর আতর্থী চিত্রপরিচালনা ছাড়াও একাধিক ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে 'দেনাপাওনা', 'পুনর্জন্ম' উল্লেখযোগ্য। এনটির প্রথম সাতখানা ছবির পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুরবাবু। এনটি তখন সবে শুরু হয়েছে। হাতে তখন অন্য কোনও পরিচালক ছিল না। বাংলা ছায়াছবির অন্য যে দু-তিনজন পরিচালক ছিলেন তাঁরা তখন ম্যাডান স্টুডিওর হয়ে কাজ করতেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে দিয়ে বীরেন সরকার উর্দু ছবির কাজ করিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি অনেকগুলি ছবিই জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু 'মহব্বত কি আঁসু' সুপার-ডুপার হিট করেছিল। এনটির অন্য পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। কলকাতার রঙ্গমঞ্চের দাপুটে অভিনেতা হিসাবে তাঁকে তখন সবাই চিনতেন। একদিন বি এন সরকার রঙ্গমঞ্চে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নিজেই শিশিরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। মি. সরকার বুঝেছিলেন শিশিরবাবু শুধু মঞ্চের জন্য নয়, চলচ্চিত্রে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভা

হেমচন্দ্র চন্দ্র

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

তাঁর আছে। শিশিরবাবু 'পল্লীসমাজ' ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া চিত্রনাট্য ও ছবি পরিচালনার কাজটিও করেছিলেন। স্টুডিওর ব্যানারে তাঁর পরিচালিত কয়েকটি ছবিও আছে।

সেই সময়ে এনটি-র অন্যতম সুপতিষ্ঠিত আরেক পরিচালকের নাম উল্লেখ না করলে টালিগঞ্জ স্টুডিওপাড়ার ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যাবে। হেমচন্দ্র চন্দ। হেমচন্দ্রের সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ থেকেই। তখন ব্যানারটা ছিল ভিন্ন। ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মক্র্যাফ্টের ব্যানারে তৈরি 'চাষার মেয়ে' ছবিতে অভিনয় করেন। হেমচন্দ্রেরও প্রথম ছবি ছিল উর্দুতে। ছবিটির নাম 'কারওয়ানই-হায়াত'। ছবিটির শুটিং হয় লাহোরে। তারপরের ছবি 'মিলিয়নিয়ার'। মি. সরকারের নির্দেশে এটিও তৈরি হয় উর্দুতে। ভিন্নভাষী দুটি ছবি পরিচালনা করে হেমচন্দ্রবাবু নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ততদিনে এনটি-র নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে অনেক বড় বড় পরিচালক তখন এনটিতে যোগদান করে ছবি নির্মাণ করে চলেছেন। হেমচন্দ্র বুঝেছিলেন এইখানে ধৈর্য সহকারে বসে থাকলে কাজ করার প্রচুর সুযোগ আসবে এবং খ্যাতি ও সুনাম পাবেন। দু'বছর বিনা কাজে বসে থাকার পরে পরিচালনার কাজ পেলেন। হিন্দিতে ছবি তৈরি করলেন 'অনাথ আশ্রম'। তারপর আবার হিন্দিতেই নির্মিত হল 'জওয়ানি কি রীত'। সরকারসাহেব এরপর থেকে হেমচন্দ্রকে দিয়ে বেশ কয়েকটি হিন্দি ছবির পরিচালনা করিয়েছিলেন। তারপর তো একদিন আগুন লেগে নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবি নষ্ট হয়ে যায়।

আরেকজনের কথা লিখে নিউ থিয়েটার্সের পরিচালকদের বিষয়ে ইতি টানব। স্টুডিও-র অন্যতম বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ফণি মজুমদার, প্রমথেশ বড়ুয়ার হাত ধরে এনটিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমেই চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব পান। একক চেষ্টায় তিনি 'অভিজ্ঞান' ছবির জন্য চিত্রনাট্য লিখে সুনাম অর্জন করেন। হাতিমার্কা ব্যানারে ফণি মজুমদারের প্রথম ছবি 'স্ট্রিট সিংগার'। তারপর একে একে তৈরি করলেন 'সাথী', 'কপালকুণ্ডলা', 'ডাক্তার' ইত্যাদি। প্রতিটি ছবিই খুব জনপ্রিয় হয়। এখানে বলে রাখা উচিত যে 'ডাক্তার' ছবির পরে ফণিবাবু এনটি ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করেন।

নিউ থিয়েটার্সে একদিকে যেমন গুণী পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছিলেন, তেমনই ছিলেন দক্ষ কলাকুশলীরা। আগামী (শেষ) পর্বে সেই সব কারিগরী দক্ষতায় ঋদ্ধ টেকনিশিয়ানদের অবদানের কথা জানাব।

গোকুল মিত্রের মদনমোহন

পান্থজন

সিদ্ধেশ্বরীর প্রতিবেশী হলেন মদনমোহন। কীভাবে মদনমোহন কলকাতায় এলেন সেটা জানতে হলে ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হবে? অতীতে এক গণ্ডগ্রামে তাঁদের অধিষ্ঠান ছিল। কথিত আছে, সেই গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এসেছিলেন মদনমোহন দর্শনে। এরপর মল্লরাজ শ্রীচৈতন্য সিংহ বিগ্রহকে নিয়ে আসেন নিজের রাজধানী বনবিষ্ণুপুরে। সেখানে এক টেরাকোটার মন্দিরে রাজা বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বনবিষ্ণুপুরে ঘনিয়ে আসে যুদ্ধের কালো মেঘ। মরাঠা রাজার পক্ষ থেকে বাংলাকে আক্রমণ করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মল্লরাজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় অবিশ্বাস্যভাবে এক সুপুরুষ ও বলবান ব্যক্তিকে দেখা যায় মল্লরাজের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে। এ-ও নজরে পরে যে, তিনি একাই বিখ্যাত দলমা দল কামানের মাধ্যমে গোলা-বারুদ প্রয়োগ করে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে থাকেন। আনুমানিক ১৭৩৮-'৩৯ সালে এই যুদ্ধের পরে রাজার বিশ্বাস জন্মায় জনৈক ব্যক্তি মদনমোহনের ছদ্মবেশ ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু যুদ্ধের পরে রাজা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পরেন এবং কপর্দকশূন্য হয়ে যান। অর্থাভাবের কারণে চৈতন্য সিংহ বাধ্য হন মদনমোহনের বিগ্রহকে কলকাতার বিত্তবান ব্যবসায়ী গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক রাখতে।

রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাহাজ ব্যবসার সঙ্গে গোকুল মিত্র যুক্ত ছিলেন। কলকাতার চাঁদনি এলাকা লটারির মাধ্যমে তাঁর অধীনে আসে। এখনও তাঁর অষ্টম পুরুষেরা সেই মালিকানা ভোগ করছেন। টাকা পরিশোধ করতে না পারায় বিত্তবান গোকুল মিত্র মদনমোহনকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। আনুমানিক ১৭৪৪-'৪৫ সাল নাগাদ। পরে কুমোরটুলি আর বাগবাজারের মধ্যের অঞ্চলে রাধা এবং গোপীকা বিগ্রহ নির্মাণ করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় মদনমোহন মন্দির ১৭৬১ সালে। ইতিহাসের অসমর্থিত সূত্র বলে রাজার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার পরে তিনি কলকাতায় এসে গোকুল মিত্রের কাছে টাকা পরিশোধের মাধ্যমে মূর্তি ফেরত চান এবং বিষ্ণুপুর মন্দিরে পুনরায় মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নাকি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অন্যসূত্র বলে, মদনমোহনের প্রতিরূপ গড়েও নাকি রাজাকে ঠকানো হয়। কিন্তু এইসব সূত্রের সমর্থনে কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। আপাতত মদনমোহনের সেবার ভার ন্যস্ত আছে এক প্রাইভেট ট্রাস্টের উপর।

বড় রাস্তার উপরেই কিন্তু পাশের গলি দিয়ে এর প্রবেশ পথ। প্রশস্ত পাথরের সিঁড়ির নীচেই জুতো জোড়া রেখে, দোতলায় মন্দিরে যেতে হয়। উপরে উঠতে গিয়ে চোখে পড়ে প্রাচীন এই বাড়ির ঠাকুরদালান, নাটমন্দির এবং চাতাল। সেখানে দেখা গেল আসন্ন দুর্গাপুজোর জন্য প্রতিমা নির্মিত হচ্ছে। ট্রাস্টের ম্যানেজার গোরাচাঁদ দত্ত জানালেন, বর্তমানে মদনমোহনের নিত্যসেবার তহবিলে মন্দা দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই বাড়ির এলাকার ভাড়াটিয়াদের ভাড়া এবং ঠাকুরদালান অস্থায়ীভাবে প্রতিমা নির্মাণের জন্য ভাড়া দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। নবনির্মিত মূর্তিগুলির মধ্যে দুর্গা যেমন আছেন, তেমনই আছেন কালী। দাদাঠাকুর মানে, জঙ্গিপুরের শরৎপণ্ডিত রচিত 'কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' গানের এক জায়গায় গোকুল মিত্রের সাধের মদনমোহনতলার উল্লেখও রয়েছে।

দোতলার বিরাট হল ঘরের এক প্রান্তে প্রায় দুশো কিলো রূপো দিয়ে নির্মিত সিংহাসনে শ্রীরাধা সহযোগে অধিষ্ঠান করছেন অষ্টধাতুর কৃষ্ণমূর্তি। এই মন্দিরে তিনি নিত্য পূজিত। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসবে বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে তিনি ঘুরে আসেন নাটমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি জায়গা থেকে। উল্লেখযোগ্য উৎসবগুলির মধ্যে রয়েছে ফুলদোল, স্নানযাত্রা, অম্বুবাচি। এরপর বিগ্রহের অঙ্গরাগের মাধ্যমে শুরু হবে জন্মাষ্টমী উৎসব। প্রতি বছর এখানে দীপান্বিতা কালীপুজোর বিসর্জনের পরের দিন পালিত হয় অন্নকূট উৎসব। সেই অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়। ভক্তদের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই হয় না। আগের দিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ভক্তসমাগম হয়। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের থাকা-খাওয়ার আয়োজন হয়ে থাকে।

এই বাড়ির পেছনেই রয়েছে গোকুল মিত্রের বসতভিটে। সেটি শেষ হয়েছে গিয়ে রাজবল্লভ পাড়ার কাছে। মন্দিরের উলটোদিকের রাস্তাটি সোজা চলে গেছে গঙ্গার দিকে। কিন্তু আমার চলার পথ বরাবরই সোজা। সংকল্প করেছি বাঁয়ে বা ডাইনে ঢুকব না। শুধু প্রয়োজনে চলার পথের কাছে থাকা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জায়গার ইতিহাস জানাব।

ফোটো: লেখক

ছুটির ফাঁদে সাপ্লিতে প্রতি বুধবার **পুজো স্পেশাল ট্রাভেল গাইড**

ছাত্র-রাজনীতি কতটা ক্ষতি করছে ছাত্রদের?

তন্ময় মণ্ডল

আজকের প্রজন্ম আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে দেশ ও সমাজ। ছাত্রজীবনই জীবন গঠনের আদর্শ সময়। ছাত্রদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অপার সম্ভাবনার বীজ। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রটিকে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয় নতুন পরিবেশের। আর কলেজ মানেই ছাত্র-রাজনীতি থাকবেই। কথায় বলে পলিটিক্স ইজ দ্য আর্ট অব পসিবিলিটি। তবে খবরের কাগজ বা নিউজ চ্যানেল খুললে ছাত্র-রাজনীতির একের পর এক নিন্দনীয় ঘটনা চোখে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল, ছাত্রজীবনে এই রাজনীতির কি আদৌ প্রয়োজন আছে? ছাত্র-রাজনীতি কতটা ক্ষতি করছে ছাত্রদের? নাকি আগামী প্রজন্মের দেশ ও দশের হাল ধরার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে? এই নিয়েই আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

রাজু লায়েক (ছাত্র): আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে একটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। বাঁকুড়া থেকে যখন কলকাতায় পড়তে এলাম কলেজে ভর্তি থেকে ফর্ম ফিলাপ, ফ্রেশার্স থেকে নবীন বরণ সবসময়ই একটা জিনিস খুব ভালো বুঝেছি পার্টির দাদাদের ছাড়া কোনও কিছুই ঠিকঠাক হবে না। প্রথম হোঁচট খেয়েছিলাম ভর্তি হতে গিয়ে আমার থেকে কম মার্কস পাওয়া ছেলে ভর্তি হয়ে গেল পার্টির চ্যানেলে আর আমাকে বলা হল দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিতে হবে। সেই কলেজে অবশ্য ভর্তি হইনি। তারপরে আর কী বলব কলেজের সব ব্যাপারেই পার্টির দাদাদের মর্জিই শেষ কথা, সেখানে আমার মতো ছেলেরা যারা গ্রাম থেকে এসেছে পড়াশোনার জন্য সত্যিই তারা খুব প্রোবলেমে পড়ে যায়। টিচাররাও খানিকটা ভয়ে ভয়ে থাকেন এদের নিয়ে। হয়তো চার-পাঁচ বছর আগে পাস করে বেরিয়ে যাওয়া ছেলেরা এখনও পার্টি করতে কলেজে আসে। এটা ভারি অদ্ভুত সিস্টেম।

প্রণবেশ জানা (অধ্যাপক): মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স আর স্টুডেন্ট পলিটিক্স দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। ছাত্র-রাজনীতি মূলত কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের মধ্যে আবদ্ধ। এতে ছাত্রদের সুবিধা-আসুবিধা, দাবিদাওয়াগুলো কলেজের প্রোফেসর, প্রিন্সিপাল বা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর কিংবা পরিচালন কমিটি অর্থাৎ গভর্নিং বডির কাছে তুলে ধরাই ছাত্র প্রতিনিধিদের কাজ। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কাজে নেতৃত্ব দেওয়া বা সমগ্র ব্যাপারটা মনিটরিং করা ছাত্র-রাজনীতির একটা পাঠ, এগুলো তাদের ভবিষ্যতে জীবনে খুবই কার্যকরী ভূমিকা নেয়। তবে দিন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ছাত্র রাজনীতির যে ধরন এখন আমাদের সামনে এসে ধরা দেয় তা কোনওদিনই কাম্য নয়। এতে শুধু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া ছাত্রটি নয় সমগ্র এডুকেশনাল সিস্টেম হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। পড়াশুনোর পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

জিসান মিত্র (ছাত্র-নেতা): একটা জিনিস মানতে হবে সব জিনিসের খারাপ-ভালো দুটো দিকই আছে। আমার মনে হয় একজন ভালো নেতা বা যে কোনও বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হবার ক্ষেত্রে এটাই উপযুক্ত সময়। তবে সব মানুষ যেহেতু সমান নয় আর খারাপ ঘটনা এত বেশি ঘটছে যে আসল মোটিভটা কোথাও কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে এবং ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে একটা বাজে ধারণা তৈরি হচ্ছে।

অতনু দে (ছাত্র): ছাত্র-রাজনীতির ভালো দিকের চেয়ে খারাপ দিকই বেশি। কলেজ-ক্যাম্পাস বা ক্যান্টিন মানেই, কিছু ছেলে যারা পড়াশুনো নয় আড্ডা মারতে কলেজে আসে তাদের বিচরণক্ষেত্র। একজন কলেজ স্টুডেন্ট হয়ে এটা মেনে নিতে খুব খারাপ লাগে। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হল ওই রাজনীতি, ক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদি...

অমিত চট্টোপাধ্যায় (অভিভাবক): ছাত্রজীবন পড়াশোনা করার সময়, রাজনীতি করার নয়। কলেজগুলোতে যে রাজনীতি হয় তার কোনও ভালো দিক আছে বলে আমার মনে হয় না। পড়াশোনা তো বাদই দিলাম শিক্ষাঙ্গন মানে একটা ত্রাস হয়ে দাড়াচ্ছে ক্রমশ। মেয়ে কলেজে যায়, চিন্তায় থাকি সারাক্ষণ। খুব খারাপ এই সিস্টেম। মেনস্ট্রিম রাজনীতিবিদরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে এই সব বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের। তারা পড়াশোনা করবে কী, টিচারদের ধরেই পেটাচ্ছে! কলেজ ভাঙচুর করছে। এটাই যদি ছাত্র-রাজনীতি হয় তাহলে বলব ছাত্রজীবনে রাজনীতি একটি মারন ব্যাধি। এতে সমাজের ভালো হবার কিছু নেই আর যদি থাকে তাহলে বলব সেই পরিকাঠামো কখনও তৈরিই হবে না।

নির্মল গুহ (সমাজকর্মী): আজকে যে ছাত্র রাজনীতি আমরা দেখছি তা সত্যিই খুব ভয়ংকর। কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রোটেকশন লাগছে ছাত্রদের বিক্ষোভ থামাতে এটা খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। আসলে আদর্শ বলে এখন আর কিছু নেই। তবে ছাত্র-রাজনীতির প্রভাবে ছাত্র-শিক্ষক দু'পক্ষই যে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৬ জুন ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

কফি হাউসে ঢুকতেই মান্না দে-র গানটা মনে পড়ল

আলমগীর বুবু (ব্যবসায়ী)

আসলে কলকাতা নামটার সাথে আমার পরিচয় হয়তো জন্ম থেকেই। ছোটবেলা থেকেই এই শহরটার প্রতি আলাদা একটা টান অনুভব করতাম। চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছে ছিল অনেক দিনেরই। সেই ইচ্ছে পূরণ হল ২০১৬ সালের ১২ই নভেম্বর। প্রথম স্বপ্নের কলকাতার সাথে পরিচয়, কলকাতার বুকে কাটানো কত সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত, সে এক অন্য অনুভূতি।

আমাদের পরিবারটা পুরোপুরি একটা ব্যবসায়িক পরিবার। তাই পড়াশুনো শেষ করে ব্যবসায় যোগ দিলাম আমিও। ব্যবসায় যেমন হয় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত নতুন প্ল্যান আর নতুন ভাবে সেই অনুযায়ী এগোনো। এই ব্যবসার প্রয়োজনই আমাকে এনে ফেলল কলকাতায়। যে শহরকে দেখবো বলে একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতর চাপা ছিল ছোট থেকেই তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হল আমার। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে সোজা পার্ক স্ট্রিট। সেখানে মারকুইস স্ট্রিটে একটা হোটেল নিলাম। ততক্ষনে রাতের চাদর ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে শহর জুড়ে। আর আলো ঝলমলে আনন্দনগরী সেজে উঠছে এক অপরূপ নৈসর্গিক সাজে। ট্যাক্সিতে আসতে আসতে দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি একের পর এক রাস্তা, উড়ালপুল অদ্ভুত সুন্দর সিস্টেমেটিক শহরটা। যাই হোক হোটেলে আগে থেকেই বুকিং ছিল, রিসেপশনে চাবি নিয়ে সোজা রুমে চলে গেলাম। একটু ফ্রেশ হয়েই বেরিয়ে পড়লাম নিউমার্কেট চত্বরে। বড় বড় শপিং মল যেমন আছে তেমনি সস্তায় ফুটপাথের দোকানও অনেক। এমন মার্কেট আমি খুব কমই দেখেছি। এটা বুঝতে অসুবিধা হল না যে কলকাতা সবরকম মানুষকেই কাছে টেনে নিয়েছে, তার কাছে কেউ ব্রাত্য নয়। মার্কেটিং করেও সেদিনের মতো ঘরে এলাম পরের দিন যেতে হবে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ। রাতে শুয়েই ছিলাম হঠাৎ মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে যেতে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে এক অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। ব্যস্ত শহরটা

কোথায় যেন উবে গেছে। এ যেন এক অন্য কলকাতা।

পরদিন ১১টায় রুম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সল্টলেক সেখানের রাস্তাঘাট বা বিল্ডিংগুলো আবার অন্যরকম। গাড়ির ড্রাইভারকে বলতে শুনলাম, দাদা একটু বেশিদূর চলে এসেছি, সামনের আইল্যান্ড থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে বুঝতে অসুবিধা হলেও পরে বুঝলাম কোনগুলোকে এরা আইল্যান্ড বলে। মিটিং সেরে ফের হোটেলে ফেরার পালা। তাই ভাবলাম একবার কলেজ স্ট্রিট চত্বরটা ঘুরে যাই। কলেজ স্ট্রিট, সে যেন এই পৃথিবীর অনন্ত বই সাম্রাজ্যের রাজধানী। কফি হাউসে ঢুকতেই মান্না দে-র সেই গানটা মনে পড়ে গেল। সত্যিই একটা মন কেমন করা পরিবেশ কফি হাউসের। যে কখনও যায়নি তাকে বোঝানো খুব মুশকিল। বেশ খানিক্ষণ সেখানে থেকে তারপর হোটেলে ফিরলাম। ফেরার পথে সারা রাস্তা শুধু তাকিয়ে ছিলাম ট্যাক্সির জানলার বাইরে। দু'পা এগোলেই যে শহরে এত বদল সে বৈচিত্র তো উপভোগ করতেই হয়।

পরেরদিন সকালের ফ্লাইট। রাতে সেদিন আবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শহরটাকে। রাতের শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে অদ্ভুত রহস্যময়তা। ফিরে আসার পর বারবার মনে পড়ে কলকাতায় কাটানো দুটো দিন। সে এক অপূর্ব সুখের স্মৃতি।

গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

বুদ্ধদেব হালদার

নিজের অভিজ্ঞতাকে পরখ করে যিনি বাংলা থিয়েটারের গণমুখী বলিষ্ঠ রূপনির্মাণে সফল হয়েছিলেন, এমনকী সমসাময়িক সময় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক পরাধীনতা, ক্ষুধা, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি রিভিউ করতে গিয়ে নিজের লেখা নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বাংলা নাটকের চল্লিশের দশকের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য।

১৯১৫ সালের ১৭ জুলাই বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। মা সুবর্ণপ্রভা দেবী। মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন 'অরণি' পত্রিকার সম্পাদক। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়।

শিক্ষক পিতার আদর্শ, সংগীতপ্রীতি, গ্রামের পরিবেশ ও সবধরনের মানুষের সঙ্গে নির্দ্বিধায় মেলামেশার ফলে তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন হয়ে উঠেছিল বড় বৈচিত্রময় ও অনেক সমৃদ্ধ। যুগচেতনা তাঁর জীবনকে গভীর শিক্ষা দিয়েছিল যা তাঁর সৃজনশীলতায় তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হিন্দু-

মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামনীতি, রুশ বিপ্লবের প্রভাব, ভারতের মাটিতে দুর্ভিক্ষের ছোবল, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম (১৯২২) প্রভৃতির একের পর এক সংগ্রামমুখর পরিবেশেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা ও নাট্যসত্তা বিকশিত হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

১৯৩০ সালে তিনি কলেজে শিক্ষালাভের জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে ভর্তি হন কলকাতার আশুতোষ কলেজে, পরে তিনি রিপন কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৩১ নাগাদ বামপন্থী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সংগঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৪০-এ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজাফ্ফর আহমেদের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তখন থেকেই পার্টির সক্রিয় সদস্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৩৮-'৩৯ সালেই প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে কাজ করার সূত্রে তাঁর কর্মজীবন ও লেখক জীবনের সূচনা হয়। গল্পকার হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যজীবনের শুরুর দিকে তিনি রেবতী বর্মণের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'জালসত্ত্ব'(১৯৪০)। এই সময়ে ঘটে চলা অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে তৎকালীন বাংলা নাটকের দিকপরিবর্তন সূচিত হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ডাকা ফ্যাসিবিরোধী 'জনযুদ্ধের' আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'গণনাট্যের' সূচনালগ্নে নাট্যকার হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (Indian People's Theatre Association, IPTA)-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৩ সালের ২৫ মে। সাধারণ মানুষের দাবি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল। তাতে বলা ছিল, 'It is a movement which seeks to make our arts the expression and organism of our people's struggle for freedom, economic justice and a democratic culture.' (IPTA, Bulletin No. 1. 1943)। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নাটক রচনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন: 'Young Dramatist, এই পোড়ার দুঃখটারে তো খুঁইজ্যা বাড়াইতে হয় না, দুঃখটা তো নিজেই তোমারে খুঁজতে আছে; সেইটারে কিছুতেই পারসোনাল হইতে দিও না। আগুনের মধ্যে হাত বাড়াইয়া দিবা, তাইর পর ভাববা, পুরতাছে সারা দেশটা।'

১৯৪৭-এ বিখ্যাত কবি মনীশ ঘটকের কন্যা মহাশ্বেতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁদের এই দাম্পত্যজীবন বেশি দিন টেকেনি। ১৯৪৮-এ পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'হাঁসখালির হাঁস', 'জনপদ', 'সোনালী মাছ' প্রভৃতি স্মরণীয়। তিনি 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'নবান্ন' নাটকটি গননাট্য সংঘের প্রথম সফল প্রযোজনা হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গমে (বর্তমানে বিশ্বরূপা) নাটকটি সাতদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল। পরিচালনা করেছিলেন বহুরূপী সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি ভাদুড়ি, গোপাল হালদার, গঙ্গাপদ বসু, নিতাই ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ সহ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ। 'নবান্ন' নাটকে লেখক সমসাময়িক চলতি পথ পরিত্যাগ করে এক নতুন আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। সিম্বলিক পটভূমি রচনা ও নাট্য দৃশ্যের প্রতিটি বিভাগে জোনাল অ্যাক্টিং–এর ব্যবহার করেন তিনি। 'মরা চাঁদ', 'গর্ভবতী জননী', 'জীয়নকন্যা' প্রভৃতি নাটকগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখায় শেষপর্যন্ত জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশাবাদী চেতনাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

একসময় তিনি হঠাৎই গননাট্য ছেড়ে চলচ্চিত্রে চলে এলেন। বোম্বেতে গিয়ে তিনি কাজও করেছেন। শেষের দিকে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য লেখা এমনকী অভিনয়ও করেছেন তিনি। 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'নাগিন', 'ডাক্তারবাবু' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তবে, সত্তর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁর নাট্য রচনার ধারাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তবুও গননাট্য আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাকেই দর্শক ও পাঠক চিরকাল মনে রাখবেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্য এক উজ্জল নক্ষত্র।